বিবর্তনে, উত্তরণে মাড়োয়ারি

অরূপ দে

কলকাতা আর তার আশেপাশে যেসব ব্যবসা ছিল, এখন তো তার প্রায় সবই দেখি মাড়োয়ারিদের হাতে ', এই খেদোক্তি অনেক বাঙালিরই। কিন্তু শুধু আফশোস করে হৃত গৌরব ফিরে পাওয়া যায়কি ? শিল্প বাণিজ্যের লাগাম কেন বাঙালির হাত থেকে মাড়োয়ারিদের কাছে চলে গেল? যাদুমন্ত্রে নয়। এর পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা বাঙালির পক্ষে কণ, মাড়ে য়ারিদের পক্ষে গর্বের।

বাঙালিরা ব্যবসার টাকা উড়িয়েছেন ফুর্তি করে। সুরা, নারী, নাচঘর, জুড়িগাড়ি, পায়রা ওড়ানো, বেড়ালের বিয়ে, একশো টাকার নোট পুড়িয়ে চা তৈরী করা- মোটামুটিভাবে এটাই ছিল গিলে করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর চুনে াট করা মিহি ধুতি পরিহিত বাঙালি বাবুর উনিশ- শতকী জীবনযাপন।

পাঠক, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, উনবিংশ শতকে বাঙালি সমাজে, সাহিত্যে, ধর্মচিন্তায় যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, য ার জোরে আজও বিশ্বের দরবারে তার সম্মান ও সম্ভ্রম, সেই জাগরণের ঐতিহ্যও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি সম ানভাবে এগিয়ে চলেছিল। একদিকে শিক্ষা ও মননশীলতার মহান বিস্তার, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় এবং আর্থিক সংকোচন। এই বৈপরীত্যের তুলনা মেলা ভার!

বাঙালি যখন খোলামকুচির মত টাকা উড়িয়ে ক্রমে দেউলিয়া হবার দিকে এগোচ্ছে, মাড়োয়ারিরা তখন বড়বাজার থেকে ধীরে ধীরে জয়যাত্রার পথে চলেছে। বাঙালিরা হয়ত ব্যবসা ডকে তুলে দিয়েছেন অথবা বেচে দিয়েছেন সুদূর রাজস্থানের মপ্রান্তর থেকে আগত মালকোচা দেওয়া ধুতি, গলাবন্ধ কোট আর কালো টুপি পরিহিত মাড়োয়ারির কাছে।

সুতরাং, অযথা অভিযোগ নয়, জানা প্রয়োজন কেন এবং কীভাবে মাড়োয়ারিরা আজ ব্যবসার শীর্ষে। শুধু প্রখর ব্যবস াবুদ্ধি নয়, মাড়োয়ারিদের এই শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে রয়েছে চরম কৃচ্ছ্রসাধন, নিরলস পরিশ্রম আর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা।

কলকাতা শহর থেকেই ধীরে ধীরে সারা দেশে মাড়োয়ারিদের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের বিস্তার। কীভাবে- এই রচনায় তারই সরেজমিনে অনুসন্ধান।

বড়বাজার,১৮৯৬

সন ১৮৯৬। আজকের মত তখনও ব্যস্ত ও জনাকীর্ণ বড়বাজার। এখন যেখানে সত্যনারায়ণ পার্ক, সেখান থেকে কয়েক পা হাঁটলেই মল্লিক স্ট্রিট। নামেই স্ট্রিট। আসলে এক ফালি গলি। দুপাশে উঁচু উঁচু মকান।

এরকমই একটি বিশাল তিনতলা বাড়ির ঠিকানা ১৮ মল্লিক স্ট্রিট। নাম কালীগুদাম। বাড়ির নামের সঙ্গে কেন এবং কীভাবে দেবী মাহাত্ম্যের যোগসূত্র স্থাপিত হল, বলা কঠিন। একতলার উঠোনে জল তোলার জন্য কপিকল লাগানো পাতকুয়ো। চারদিকে টানা বারান্দার গায়ে সারি সারি ঘর। ঘরগুলিতে নানা ব্যবসায়ীর অফিস। দোতলাতেও তাই। তিনতলার ম াড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং তাদের কর্মীদের খাওয়া দাওয়ার জন্য রান্নাঘর বা 'বাসা'।

দূর রাজস্থানের শেখাওয়াটি অঞ্চল থেকে কলকাতায় এসে এই বাড়িরই দোতলায় একটি ঘর নিয়ে আফিমের ব্যবসা শু করেন প্রয়াত শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস (সংক্ষেপে জি.ডি) বিড়লার বাবা রাজা বলদেও দাস। তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে একই ঘর থেকে ব্যবসা চালতেন আরও তিন 'গদ্দিদার'।

কলকাতায় এভাবেই বিড়লাদের ব্যবসার পত্তন হয় উনিশ শতকের শেষভাগে। আফিমের ফাটকাবাজীতে বিপুল টাকা রোজগারের পর নিজের ছেলেদেরও কলকাতায় নিয়ে এলেন বলদেওদাস। একই গদিতে সকাল বিকেল অফিস। আবার সেই গদিতেই রাতে শোওয়া আর ঘুম। স্থানাভাবের জন্য বিড়লারা পড়ে জাকারিয়া স্ট্রিটে একটাবাড়ি ভাড়া করে উঠে যান। এই বাড়িতে বহুদিন কাটিয়েছিলেন তাঁরা। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত গুসদয় দত্ত রোডে তৈরি হল বিড়লা পার্ক।

১৮ মল্লিক স্ট্রিটে কালীগুদামের দোতলায় সেই ঘরটি বহুদিন ধরেই আর ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হয়না। তা বলে ঘরটি এখনও ছেড়ে দেন নি বিড়লারা। দরজার পাশে ঝকঝকে পিতলের ফলকে লেখা,'বিড়লা ব্রাদার্স'। ঘরের ভিতরে মেজের প্রায় পুরোটা জুড়ে গদি। তার ওপর বেশ কয়েকটি তাকিয়া ছড়ানো। একপাশে হিসেব- পত্তর লেখার জন্য একটি নিচু ডেস্ক। রাজা বলদেও দাসের আমলে ঠিক এভাবেই সাজানো থাকতো ঘরটি। দেয়ালে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবির পাশে ফ্রেমে বাঁধানো বলদেও দাস - মাথায় পাগড়ি, গায়ে গলাবন্ধ কোট।

ঘরের দেখাশোনা করার জন্য রয়েছেন দুজন লোক। ১৮৯৬ সালের পর অনেকবারই ভাড়া বেড়েছে। তবে ১৯৯২ সালেও ভাড়ার অঙ্ক ছিল তিনশোরও কম। মাসে মাসে ভাড়া গুণে, দুজন কর্মীকে মাইনে দিয়ে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ঘরটি সংরক্ষন করে চলেছেন বিড়লারা। দেওয়ালিতে বিড়লা পরিবার থেকে কেউ না কেউ আসেন। পুজো হয়। সাবেক ঐতিহ্যের প্রতি ঠিক এতোটাই শ্রদ্ধাশীল বিড়লারা।

কালীগুদাম থেকে বিড়লা পার্ক- এই যাত্রার একটা প্রতীকী তাৎপর্য আছে। ছোট্ট একটি ভাগের ঘর নিয়ে ব্যবসা শু করে নিজেদের বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতার জোরে শিল্পজগতের শীর্ষে উঠে এসেছেন বিড়লারা। সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের প্রায়প্রত্যেকেই এভাবেই সাফল্য অর্জন করেছেন। সামান্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছেন তাঁরা। এক কথায়, এই হল মাড়োয়ারিদের আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাস।

দু পুষ আগে পশ্চিম ভারতের ম অঞ্চল ছেড়ে যেসব মাড়োয়ারি জীবিকার সন্ধানে বাংলায় এসেছিলেন, তাদের বড় হয়ে ওঠার পেছনে ছিল অসীম ধৈর্য, পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার। বিলাসিতা দূরে থাক, সমস্ত বাহুল্য বর্জন করে অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা। স্বপ্ন একটাই বাড়াতে হবে ব্যবসা, কামাতে হবে টাকা। ট্রেডিংয়ের মুনাফা লগ্নী করেছেন শিল্পে। বাপ- ঠাকুর্দার এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে শিল্পে ও বাণিজ্যে মাড়োয়ারিরা এখন সবার সেরা।

প্রয়াত নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, মাড়োয়ারিদের টাকা বানানোর মধ্যে তিনি অন্তত কোন দোষ দেখেন না। কারণ তারা জাতে 'বানিয়া', অর্থ রোজগারই তাদের 'ধর্ম'। তাঁর একথা শুনে অনেক নাক-উঁচু বাঙালির ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি কিছু ভুল বলেন নি।

বিড়লা পার্ক

গুসদয় দত্ত রোডের মুখে বিড়লা কারিগরী সংগ্রহশালা। তাঁর পাশ দিয়ে বিড়লা পার্কের প্রবেশ পথ।

একসময় এই সংগ্রহশালা এবং মহাদেবী বিড়লা বিদ্যালয়ের জমি বিড়লা পার্কের অংশ ছিল। পরে স্কুল ও মিউজিয়াম তৈরির জন্য বিড়লারা এই জমি দান করেন।

১৯৯১' ডিসেম্বর। সম্পাদকের নির্দেশ, মাড়োয়ারিদের নিয়ে ইংরেজিতে একটা দীর্ঘ রচনা লিখতে হবে। চমৎকার অ্যাসাইনমেন্ট। কিন্তু কাজটা করে ওঠা মোটেই সহজ নয়। মাড়োয়ারি শীর্ষ ব্যবসায়ীরা আজ কলকাতায় তো কাল মুম্বাইয়ে, পরশু দিল্লিতে তো তরশু বাঙ্গালোরে। অথবা দেশের বাইরে। তাঁদের তো ধরাই মুশকিল।

বিড়লা পার্কে ঢুকে দুপাশে গাছঘেরা ছায়াঘন প্যাসেজ ধরে কিছুটা এগোলে বাঁদিকে কৃষ্ণকুমার (কে.কে) বিড়লার কুঠি। তারপর বসন্তকুমার (সংক্ষেপে বি.কে) বিড়লার 'বসন্ত কুঞ্জ'। শীতের সকাল, বাতাসে ঝিরঝিরে ঠান্ডা। সবুজ লনের ওপর ডেকচেয়ার পেতে নরম, সোনালি রোদে পিঠ রেখে কাগজ পড়ছিলেন বি.কে। ঘনশ্যামদাসজির মৃত্যুর পর থেকে বি.কে এবং তাঁর ছেলে আদিত্যের (অধুনা প্রয়াত আদিত্য বিক্রম বিড়লা) আলাদা ব্যবসা। ১৯৯০-৯১ সালে বি.কে - আদিত্য গ্রুপের বাৎসরিক টার্ন ওভার ছিল ৫৩৮৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। সেদিক থেকে বসন্তকুমারকে এদেশে ধনীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম বললে ভুল হবে না নিশ্চয়ই।

এদেশের শিল্পক্ষেত্রে যে দুজন ব্যক্তিকে পথিকৃৎ বলা চলে, তাঁদের মধ্যে একজন জামশেদজি টাটা, আর একজন ঘনশ্যামদ

াস বিড়লা। একজন পার্শি, আর একজন মাড়োয়ারি। বিড়লারা কী ভাবে এত বড় ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন? - 'সে সময় নতুন শিল্প গড়ে তোলা এখনকার মত সহজ ছিল না', হাতের কাগজ পাশের টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন বি.কে। ফর্সা, সৌম্য চেহারা। চোখে চশমা। পরণে ব্রাউন স্যুট। - 'এখন তো চাইলেই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ধার পাওয়া যায়। তখন পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। ব্যবসার লাভের অংশ শিল্পে লগ্নি করতে হত। তারপর সেই শিল্পকে ল াভজনক করে তুলতে দিনরাত পরিশ্রম করতেন বাবা। এভাবেই তিনি একের পর এক শিল্প বাড়িয়ে গেছেন।'

।। সেকাল - একাল।।

মাড়োয়ারিরা যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁদের মূলধন ছিল দু টি। তা হল - যেমনটি আগেই বলেছি-অসম্ভব পরিশ্র মের ক্ষমতা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন। স্ত্রী- পুত্র- কন্যাকে রাজস্থানের গ্রামে ফেলে রেখে দিনের পর দিন বড় বাজারের গদিতে বসে ব্যবসা বাড়াবার চেষ্টা করে গেছেন মাড়োয়ারি পুষেরা।

প্রথমে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ শু করেন তাঁরা। কমিশন ছিল ১০০ টাকায় ১২ আনা। কেউ কেউ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেন। বিড়লা, পোদ্দার, ইত্যাদি পরিবার গোড়ার দিকে আফিমের কারবার করে বড়লোক হন। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতা হয়ে আফিম চালান যেত চীনে। বড়বাজারের একটি জায়গায় নিয়মিত আফিম নীলাম হত। সেই থেকে জায়গাটির নাম হয়ে যায় 'আফিম চৌরাস্তা'।

কলকাতায় আসার আগে শেখাওয়াটি থেকে জীবিকার সন্ধানে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন বিড়লারা। মহিলারা ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশেই থাকতেন। কলকাতার মত বোম্বাইতেও গদিতেই সারাদিন কাটত মাড়োয়ারিদের। বি.কে বললেন, 'আমার কাকা একবার টানা সাত বছর বোম্বাইয়ে ছিলেন। তারপর দেশে ফিরে নিজের ছেলে মেয়েদের চিনতেই পারেন নি তিনি। তারা সকলে তখন অনেক বড় হয়ে গেছে।'

তবে মাড়োয়ারি পুষ যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বছরের পর বছর ভিন রাজ্যে থাকতে পারতেন, তার একটা বিশেষ কারণ ছিল । মাড়য়ারিরা যৌথ পরিবারে বাস করতেন। পরিবারের বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য অন্তত একজন পুষ দেশে থাকতেন । এ জন্য শহরে বসে মাড়োয়ারিরা নিদ্বেগে ব্যবসা চালাতেপারতেন।

যৌথ পরিবারের আর একটি বিশেষ সু বিধা ছিল। সংসারের খরচ মিটিয়ে যা বাড়তি থাকত, তা ব্যবসা বাড়াবার জন্য ব্যবহার করতেন মাড়োয়ারিরা। পরিবার যাঁর যত বড়, তাঁর উদ্বৃত্ত অর্থও তত বেশি। যৌথ পরিবার এভাবে মাড়োয়া রিদের ব্যবসা সম্প্রসারণেও সহায়ক হয়েছে।

মাড়োয়ারি যৌথ পরিবার এখন ভাঙনের মুখে। শহরে একান্নবর্ত্তী পরিবার খুব কমই চোখে পড়ে। আর্থিকবিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ব্যবসার পক্ষে এটাই মঙ্গল। চাটার্ড অ্যাকাউন্টান্ট পবন ইয়া বললেন, 'আমি আমার ক্লায়েন্টদের বলি, যত তাড় াতাড়ি আপনারা যৌথ পরিবার ছেড়ে ভিন্ন হয়ে বাস করতে পারবেন , ততই ভাল। কারণ সংসারে অশান্তি থাকলে ব্যবস াতেও তার ছাপ পড়ে। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

ইয়া শুধু আর্থিক বিশেষজ্ঞই নন, শিল্পপতিও বটে। একটি গণ সিরামিক কারখানা কিনে তাকে লাভজনক করে তোলেন তিনি। সংস্থাটির নাম ঃ 'ইয়া সিরামিক প্রাইভেট লিমিটেড '। রাসেল স্ট্রিটে তাঁর সাজানো গোছানো অফিস। বললেন, 'যুগ বদলেছে । একান্নবর্তী পরিবারে থাকার মত মানসিকতা মাড়োয়ারিদের আর নেই। যৌথ পরিবারে থাকতে হলে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। আজকের মাড়োয়ারিরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন । তাঁরা কিছু ছাড়তে রাজি নন। সে জন্য যৌথ পরিবার ভেঙ্গে দিয়ে পৃথগন্ন হওয়াই ভাল।'

সে যুগে মাড়োয়ারিদের মানসিকতা সত্যিই অন্যরকম ছিল। ব্যবসা থেকে প্রচুর টাকা এলেও খুব সন্তর্পণে পারিবারিক জীবন থেকে বিলাসিতাকে দূরে সরিয়ে রাখা হত। বি.কে বিড়লা বললেন, 'আমাদের তো কোন কিছুর অভাব থাকার কথ া নয়। তা সত্ত্বেও স্কুলে কখনও নতুন বই পড়তে পাইনি । দাদারা উঁচু ক্লাসে উঠলে তাঁদের পুরনো বইপত্র দিয়েই কাজ চ ালাতে হত। নতুন জামাকাপড়ও কেনা হত খুব কম। দাদাদের জামা প্যান্ট দিয়েই যতদিন সম্ভব কাজ চালাতাম।'

বি.কে- র স্ত্রী সরলা বিড়লার জীবনযাত্রাও অতি সাধারণ। বললেন, 'আগে খিদিরপুর থেকে এক বুড়ো দর্জি এসে আমার ব্লাউজের অর্ডার নিয়ে যেত। মজুরি নিত দু টাকা। প্রথম যখন আমি পার্ক স্ট্রিটে পাঁচ টাকা মজুরিতে ব্লাউজ তৈরীর অর্ডার দিলাম তখন বাড়ির এক প্রবীণ মহিলা আমাকে ডেকে বললেন, এত বেশি খরচ করো না। বিলাসিতা খুব খারাপ জিনিস।'

তবে বি.কে এবং সরলা দুজনেই স্বীকার করলেন যে, যুগ পাল্টাছে। তাঁরা যেভাবে বড় হয়েছেন, ছেলে মেয়েদের অত অ াটপৌরেভাবে মানুষ করতে পারেননি। বি.কে বললেন, 'আমরা এখনও খুব সরল জীবনযাপন করি। তবে ছেলেমেয়েরাও আমাদের মত আড়ম্বরহীন জীবন কাটাবে এটা আশা করা যায় না।'

আজকের মাড়োয়ারি তনদের সঙ্গে প্রবীণদের জীবনযাত্রার অমিল প্রচুর। একটা সময় ছিল যখন মাড়োয়ারি পুষেরা ধুতি-কুর্তার ওপর গলাবন্ধ কোট গায়ে না চাপিয়ে বাইরে বের হতেন না। মাথায় থাকত পাগড়ি বা কালো টুপি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা- যে ঋতুই হোক না কেন, পাঞ্জাবীর ওপর কোট থাকবেই।

আজকাল এই প্রাদেশিয় সাজে সজ্জিত মাড়োয়ারি আর চোখে পড়ে না বললেই চলে। রাজস্থানী মহলে বড়বাজারের নাম 'মাড়োয়ারি নগর'। সেখান থেকে মাড়োয়ারিদের ঐতিহ্যবাহী গদির পাটও উঠে যাচ্ছে। চেয়ার- টেবিলেরই চল বেশি। কিছু দোকানে গদি এখনও রয়েছে। কিন্তু গদিতে বসে যাঁরা ব্যবসা চালাচ্ছেন, তাঁদের পরণে প্যান্ট-শার্ট বা সাফারি। বিলাসিতার প্রতি মাড়োয়ারি তনদের প্রবল ঝোঁক। পবন ইয়া বললেন, 'এটা হল যাকেবলে যুগের লক্ষণ। গত প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের জেনারেশনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। মাড়োয়ারি তনরা মনে করে, জীবনকে যদি উপভোগই না করতে পারে তাহলে পয়সা রোজগার করে লাভ কি!'

কেন কলকাতা ?

মাড়োয়ারি শব্দটির যথেচ্ছ প্রয়োগে অনেকের আপত্তি আছে। তাঁরা বলেন, রাজস্থান থেকে যাঁরাই গিয়ে অন্যত্র বসবাস করছেন তাঁদের সবাইকেই ভুল করে পাইকারি হারে মাড়োয়ারি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। 'সারা ভারত মাড়োয়ারি সম্মলন' - এর সভাপতি রতন শাহ বললেন, 'রাজস্থানীরা প্রথম পূর্ব ভারতে আসেন ষোল শতকে। রাজা মান সিংহের সেনাবাহিনীর রেশন (খাবার) যোগানের জন্য যোধপুর থেকে প্রচুর লোক বাংলায় এসেছিল তারাই নিজেদের মাড়োয়ারি বলে পরিচয় দিয়েছিল। কারণ যোধপুরের আর এক নাম মাড়োয়ার ।'

শাহ মনে করেন, মাড়োয়ার থেকে যাঁরা এসেছেন একমাত্র তাঁদেরই মাড়োয়ারি বলা উচিত। বাকিরা মাড়োয়ারি হতে যাবেন কেন? রতন শাহ র যুক্তিতে ভুল নেই। তবে মাড়োয়ারি নাম এত চালু হয়ে গেছে যে সেটা পাল্টাতে বেশ বেগ পেতে হবে। সেজন্য বিশেষজ্ঞরা এক মাড়োয়ারি নামটিই গ্রহনযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। মাড়োয়ারিদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি এবং জীবনযাপন নিয়ে গভীর গবেষণা করে একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই লিখেছেন সমাজতাত্ত্বিক টমাস টিমবার্গ। তিনি বলেছেন, রাজস্থান থেকে আগত ব্যক্তিদের 'রাজস্থানী '-ই বলা উচিত, তবে 'মাড়োয়ারি' বললেও তেমন ক্ষতি কিছু নেই।

দেশের অন্যান্য শহরের বদলে কলকাতাকেই মাড়োয়ারিরা কেন তাঁদের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিলেন- এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ব্রিটিশরা আসার পরে রাজস্থানের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলিতে ব্যবসা - বাণিজ্যের সুযোগ ক্রমশ কমে আসতে থাকে। এর ফলে বিকল্প ব্যবসার খোঁজে মাড়োয়ারিরা দলে দলে দেশ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন। কেউ যান বোম্বাইয়ে, কেউ আসেন কলকাতায় তবে বোম্বাইয়ে, কেউ আসেন কলকাতায় তবে বোম্বাইটার তুলনায় কলকাতায় অনেক বেশি মাড়োয়ারি এসেছিলেন। কারণ কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতায় তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ অনেক বেশি ছিল।

ষোল শতকে যাঁরা বাংলায় আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগৎ শেঠ। স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী অধুনা প্রয়াত বিজয় সিং নাহারের পূর্বপুষেরাও সে সময় আগ্রা হয়ে মুর্শিদাবাদ গিয়ে বসবাস শু করেন। শ্রীনাহার আমাকে বলেছিলেন, 'আগ্রায় আমার পূর্বপুষদের সঙ্গে জগৎ শেঠের দেখা হয়। ওঁরা একইসঙ্গে মুর্শিদাবাদে আসেন। আমার পূর্বপুষেরা কিছু জমিজমা কিনে ছোটখাট একটি জমিদারি গড়ে তোলেন। অন্যদিকে জগৎ শেঠ মুর্শিদাবাদে কুঠি স্থাপন করে মহাজনী ব্যবসা শু করেন।'

উনিশ শতকে মাড়োয়ারিরা সবথেকে বেশি সংখ্যায় কলকাতায় আসেন । যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ এবং কঠিন। ঘনশ্যামদাস বিড়লা তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন, মভূমির মধ্যে দীর্ঘ পথ উটের পিঠে পাড়ি দিতে হত। রাজস্থান থেকে সরাসরি কলকাতায় আসার সুযোগ ছিল না। দিল্লি হয়ে আসতে হয়। দিল্লির সব থেকে কাছের ষ্টেশন ছিল হয় ইন্দোর নয় আমেদাবাদ। উটের পিঠে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে আমেদাবাদ পর্যন্ত আসতে হত। দল বেঁধে মাড়োয়ারিরা রওনা হতেন 'পরদেশ '

অভিমুখে। কোন মাড়োয়ারি পরিবার প্রথম কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে থাকতে শু করেন, তার হদিশ পাওয়া কঠিন। তবে গোড়ার দিকে যাঁরা এসেছিলেন, বদ্রিদাস মুকিম ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

'মুকিম' কথার অর্থ রাজ জহুরী। লখনৌতে বদ্রিদাসের জহরতের কারবার ছিল। খোদ নবাব ছিলেন তাঁর খদ্দের। ১৮৩৫ সাল নাগাদ মুকিমরা লখনৌ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। মুকিমের সংগ্রহে এমন সব দুষ্প্রাপ্য ওবহুমূল্য রত্ন ছিল যা দেখে ব্রিটিশরা তাঁকে 'কোর্ট জুয়েলার' নিয়োগ করেছিল। সাহেবদের থেকে 'রায়বাহাদুর ' খেতাবও পেয়েছিলেন তিনি। উত্তর কলকাতায় মানিকতলার কাছে বদ্রিদাস টেম্পল রোড। যেখানে সুরম্য উদ্যানশোভিত জৈন মন্দিরটির কথা কারে ারই অজানা নেই। সাধারণের কাছে এটি 'পরেশনাথের মন্দির' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। নববুই দশকের গোড়ায় মন্দির দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল বদ্রিদাসের পৌত্র বিনয় মুকিমের ওপর। তিনি বললেন, 'প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত সফরের সময় তাঁর সম্মানে রত্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন বদ্রীদাস।' এই বদ্রীদাসই তাঁর মাঁ'র ইচ্ছে পূরণ করতে বহু খরচ করে ১৮৬৭ সালে মন্দিরটি তৈরী করান। ১৯১৭সালে তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রী শ্রী শীতলনাথজী মন্দির প্রাঙ্গনে তাঁর মর্মরমূর্তি রয়েছে।

মার্কসবাদী রতন শাহ

মাড়োয়ারি মানেই ব্যবসায়ী। এটাই প্রচলিত ধারণা। মাড়োয়ারিরা যে ব্যবসায়ী - প্রধান সম্প্রদায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মাড়োয়ারি মানেই ব্যবসায়ী, এই ধারণা ভুল। রতন শাহ বললেন, 'মাড়োয়ারিদের মধ্যে যেকত ডাক্তার, ইঞ্জি নিয়ার , চাটার্ড অ্যাকাউন্টান্ট রয়েছেন, সে খবর কজন রাখেন।' শাহ- এর মতে, মাড়োয়ারিদের পুরোপুরি ব্যবসায়ী স ম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য দায়ী কমিউনিস্টরা। বললেন, 'স্বাধীনতার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাত্ত্বিক নেতা ড ায়াকভের প্রভাবে মাড়োয়ারিদের বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত করেছিলেন এদেশের কমিউনিস্টরা। সে অপবাদ এখনও ঘোচে নি। মাড়োয়ারিদের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম নয়, তা ঠিক। কিন্তু অন্যান্যরা ?তাঁরা হয় ব্যবসায়ী, নয় ব্যবসায়ী হলেও ধনী নন।'

শাহ নিজে ছাত্রজীবনে মার্কসবাদী রাজনীতি করেছেন। এখনও তত্ত্বগতভাবে তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। অন্যদিকে আব ার বিবেকানন্দের রচনারও তিনি দান ভক্ত। মাড়োয়ারিদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। আশির দশকে রাজস্থানে সতীদাহের ঘটনার প্রতিবাদে বড়বাজার থেকে রাজভবনপর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

'মাড়োয়ারিদের সম্পর্কে কমিউনিস্টরা ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন,' রতন শাহ বললেন। 'আসলে পেশা নয়, মাড়োয়ারিদের চিনতে হবে তাঁদের ভাষা এবং সংস্কৃতি দিয়ে।' মাড়োয়ারি হল রাজস্থানী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি উপভাষা। রাজস্থানী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সাহিত্য আকাদেমি। মাড়োয়ারি সম্মেলন এখন এই ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন বলে শাহ জানালেন

এই কলকাতাতেই বহু নাম করা মাড়োয়ারি আছেন বা ছিলেন যাঁরা আদৌ ব্যবসায়ীই নন। এই 'আছেন বা ছিলেনের'দলে পড়েন প্রবীণ আইনজীবী ভগবতীপ্রসাদ খৈতান, চক্ষু-বিশেষজ্ঞ এবং শহরের প্রাক্তন শেরিফ জে কে শরাফ, অভিনেতা শ্যামানন্দ জালান। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বিমল জালানও এই কলকাতারই ছেলে, সম্পর্কে তিনি শ্যামানন্দ জালানের ভাই।

ভগবতীপ্রসাদ তথা বি পি খৈতান হলেন সেই যুগের লোক, যখন কলকাতায় মাড়োয়ারিরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নববই দশকের গোড়ায় তাঁর বয়স ছিল আশিরও বেশি । দাদা কালীপ্রসাদ খৈতান ছিলেন অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর বিশিষ্ট বন্ধু। আর এক দাদা দেবীপ্রসাদ সংবিধান -রচয়িতা কমিটির সদস্য ছিলেন। বি পি খৈতান নিজে রামকৃষ্ণ মিশন এবং শ্রীশিক্ষায়তন সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। পরের দিকে বয়সের ভারে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নেন। বললেন, ' নেতাজি এবং আরও অনেক নেতাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। নেতাজির এলগিন বাড়ীতে তো আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম।'

অসহযোগ আন্দোলনের কিছু আগের কথা। খৈতানরা তখন থাকতেন বড়বাজার অঞ্চলে, হ্যারিসন রোডেএকটি ভাড়া ব াড়িতে। কাছেই সংখ্যালঘু - অধ্যুষিত বস্তিঅঞ্চল। যে কোন কারনেই হোক না কেন, সে সময় ওই অঞ্চলে খুব উত্তেজনা

চলছিল। প্রায় দাঙ্গা বেঁধে যায় আর কি! একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে খৈতানরা দেখলেন যে লাঠি, লোহার রড, ইত্যা দি নিয়ে একদল মারমুখী লোক বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। দরজা-জানলা বন্ধ করে অনেকক্ষন চুপ করে বসে থাকার পরও দাঙ্গ াবাজদের সরার কোন লক্ষন দেখা গেল না। গৃহকর্তা কালীপ্রসাদ তখন ফোন করলেন বন্ধু শরৎচন্দ্র বসুকে। খৈতান পরিবার বিপন্ন জেনে শরৎচন্দ্র ছোট ভাই সুভাষচন্দ্রকে পাঠালেন তাঁদের উদ্ধার করে আনার জন্য।- 'নেতাজি তখন স্কটিশচার্চ কলেজে পড়েন', বিপি খৈতান বললেন। - 'নিয়মিত এন সি সি করেন। খবর পেয়েই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দুটো গাড়িতে আমাদের বাড়িতে চলে এলেন। আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন নিজেদের এলগিন রোডের বাড়িতে।'

এই ঘটনা যখন ঘটে, বি পি খৈতান তখন নেহাতই ছোট। তবু শৈশবের সেই স্মৃতি অমলিন। বললেন, 'মনে আছে, নেতাজি খুব ঘরোয়া আড্ডা ভালোবাসতেন। কলেজ থেকে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে আড্ডায় বসে যেতেন। গল্পে গল্পে কিভাবে যে সময় চলে যেত, বোঝাই যেত না!'

শিল্প সংস্কৃতি

পেশায় সলিসিটর হলেও অভিনেতা হিসাবেই প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ জালান। হিন্দি থিয়েটারের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, শ্যামানন্দ জালানকে তাঁরা একডাকে চেনেন। একধারে অভিনেতা ও নির্দেশক তিনি। মঞ্চে ও পর্দায় সমান দক্ষএবং জনপ্রিয়। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'চোখ ' ছবিতে অভিনয় করে চিত্রামোদীদের মনোযোগ কেড়েছিলেন শ্যামানন্দ। মৃনাল সেনের টেলিফিল্ম 'তসবির আপনি আপনি ' এবং সন্দীপ রায়ের টিভি সিরিয়ালেও অভিনয় করেছেন তিনি। বললেন, 'থিয়েটার আমার প্যাশন। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে কাজ করি। তারপর থিয়েটার।'

মোহন রাকেশের 'আষাঢ় কে একদিন ' ও 'আধে আধুরে' এবং বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিত ' মঞ্চস্থ করার পর কলক াতার হিন্দি নাট্যজগতের এক নম্বর ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন শ্যামানন্দ জালান। বিজয় তেন্ডুলকারের 'সখারাম বাইন্ডার' এবং 'কন্যাদান ' মঞ্চস্থ করেও যথেষ্ট প্রশংসিত হন তিনি। অনেকেরই মনে থাকতে পারে, আশিরদশকে জার্মান নির্দেশক ফ্রিৎস বেনেভিৎস কলকাতায় শেকসপিয়ারের 'কিং লিয়ার' পরিচালনা করেছিলেন। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্যাম ানন্দ জালান।

এতদিন ধরে থিয়েটার করার পরও একটা ব্যাপারে এখনও আক্ষেপ যায় নি তাঁর। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিরপ্রতি সংখ্যাগু ম াড়োয়ারির অনীহা তাঁকে ব্যথিত করে। বললেন, 'সত্যি বলতে কি, খুব কম মাড়োয়ারিই আমার থিয়েটার দেখতে অ াসেন। মাড়োয়ারি তণ-তণীরা আজকাল পছন্দ করে হিন্দি ফিল্ম এবং ফ্যাশনেবল মিউজিক । ভাল থিয়েটারে তাদের অ াগ্রহ কম।'

তা সত্ত্বেও কেন এখনও থিয়েটারে নিয়োজিত তিনি? বললেন, 'থিয়েটার করি নিজের তাগিদে। এটা জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমার নাটক মাড়োয়ারিরা বেশি না দেখলেও অন্যান্যরা তো দেখেন। তাই মনে হয়, কলকাতায় হিন্দি থিয়েটারের ভবিষ্যৎ এখনও শেষ হয়ে যায় নি।'

কলকাতাতেই এমন অনেক মাড়োয়ারি ছিলেন বা আছেন যাঁদের সঙ্গে শিল্পও সংস্কৃতির নিবিড় যোগ ছিল বা আছে। প্রয় াত চিত্রকর ইন্দ্র দুগারের পরিচয় নতুনভাবে দেবার কিছু নেই। তাঁর বাবা হীরাচাঁদ দুগারও ছিলেন একজন নামকরা শিল্পী। শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর থেকে তিনি ছবি আঁকা শিখেছিলেন। ইন্দ্র দুগার ছিলেন বিজয় সিং নাহারের জামাই।

কলাপ্রেমী হিসাবে বি.কে বিড়লার খ্যাতি তো ঝিজোড়া। তাঁর নিজস্ব শিল্প সংগ্রহ দেখার মত। দক্ষিন কলকাতায় বিড়লা আকাদেমি তাঁরই তৈরি। মেয়ে জয়শ্রী মেহেতা এখন এই আকাদেমি দেখাশোনা করেন। বিড়লা আকাদেমিতে সংরক্ষিত চিত্রের সিংহভাগই এসেছে বি.কে- র ব্যক্তিগত সংগহ থেকে।

-'প্রথম প্রথম ঘর সাজাবার জন্যই আমরা ছবি কিনতাম', সহজ সরল স্বীকারোক্তি করলেন বি.কে।- '১৯৫১ সালে বিড়লা পার্ক তৈরীর কাজ শু হয়। শেষ হতে চার বছর সময় লেগেছিল। নতুন বাড়ি সাজানোর জন্য আমরা অনেকগুলি ছবি কিনেছিলাম। এভাবে ধীরে ধীরে আর্টের প্রতি একটা সত্যিকারের আগ্রহ অনুভব করতে শু করি।'

এরপর দেশ-বিদেশের বড় বড় আর্ট ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শু করেন বি.কে ও সরলা বিড়লা। - 'গোড়ার দিকে শুধু বিদেশি ছবিই কিনতাম। কন্টিনেন্টাল আর্টের প্রতিই ঝোঁকটা বেশি ছিল', বি.কে বললেন ।- 'এরপর এক বন্ধু

বললেন ,ভারতীয় শিল্পের প্রতি তোমাদের আগ্রহ নেই কেন? তাঁরই অনুরোধে ভারতীয় শিল্পীদের ছবি কিনতে শু করি। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে আমরা এখন ভারতীয় আর্টে পুরোপুরি নিমজ্জিত।' দেখতে দেখতে বি.কে - র ব্যক্তিগত সংগ্রহ এত বেড়ে গেল যে বিড়লা পার্কে তা রাখার জন্য স্থান অকুলান হয়ে পড়ল।-'তখন আমাদের সংগ্রহের বেশির ভ াগটাই বিড়লা আকাদেমিকে দিয়ে দিলাম', সরলা বিড়লা জানালেন।

বি.কে এবং সরলা বিড়লার শিল্পপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল ছেলে আদিত্য বিক্রম বিড়লার মধ্যেও। আদিত্যনিজেও ছিলেন শিল্পী। অবশ্য মৌলিক শিল্পী নন। তবে বড় বড় শিল্পীদের ছবির অদ্ভুত ভালো রিপ্রোডাকশন করেছিলেন তিনি। -'ছোটবেলা কে.এন সেন নামে এক ভদ্রলোক এসে আদিত্যকে ছবি আঁকা শিখিয়ে যেতেন।' সরলা জানালেন।-'এছাড়া ওর কোন ফম র্াল ট্রেনিং হয় নি। নিজেই বাড়িতে বসে আঁকতো। পুরনো দিনের বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবির রিপ্রোডাকশন করত।' বোম্ব াইবাসী হবার পর কাজকর্মের চাপে ছবি আঁকাঅনেকদিন বন্ধ রেখেছিলেন আদিত্য । তারপর একবার ছেলে কুমারমঙ্গল অসুস্থ হয়ে পড়ে।' - 'ছেলের পরিচর্যার জন্য অনেকদিন অফিসে যায় নি আদিত্য ', সরলা বললেন।- 'বাড়িতে বসে ছেলেকে শুশ্রূষা করার ফাঁকে ফাঁকে ও আবার ছবি আকতে শু করেছিল । ' এরপর আমৃত্যু ছবি এঁকে অবসর কা টিয়েছেন আদিত্য।

শুধু বি.কে বিড়লাই নন। প্রয়াত গোপীকৃষ্ণ কানোরিয়াও ছিলেন একজন বিশিষ্ট আর্ট কালেকটর। মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের যে বিপুল সংগ্রহ তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা যে কোন মিউজিয়ামে স্থান পাবার যোগ্য । ইদানিং শিল্প বিশেষজ্ঞ হিসাবে নাম করেছেন শিল্পপতি সুরেশ নেওটিয়া। ছবি সংরক্ষনের জন্য নানা মিউজিয়াম তাঁর পরামর্শ নিয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের শেষদিকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলে চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্যের ১২ জোড়া ছবি নিলাম হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেশ ও হর্ষ নেওটিয়া। ২৪ টি ছবি বিক্রি করে সংগঠিত হয়েছিল এককোটি টাকারও বেশি। এই ট াকা কলকাতার উন্নয়নে ব্যয় হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু । সেদিন ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দরবার হলে নীলামের আসরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মাড়োয়ারিশিল্পপতি।

ধর্মীয় জীবন

মাড়োয়ারিরা চরিত্রগতভাবে ধর্মপ্রাণ। অধার্মিক বা নাস্তিক মাড়োয়ারি প্রায় নেই বললেই চলে। দেবদেবীদের প্রতি তাঁদের প্রবল ভক্তি। বিশেষ নিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। মাড়োয়ারিদের জীবনে ধর্মের প্রভাব এতই গভীর ও ব্যাপক যে , তাঁদের আচার -আচরণ, চালচলন, খাওয়া -দাওয়ার মধ্যেও তার ছাপ স্পষ্ট।

আজকাল অতি আধুনিক কিছু মাড়োয়ারি তণ-তণী বাড়ির বাইরে হোটেল- রেস্তোরাঁয় গিয়ে 'অখাদ্য কুখাদ্য' খেয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে তাদের অধিকাংশ নিরামিষাশী। মদ্যপানের প্রতিও অনেক মাড়োয়ারির বিশেষ টান চোখে পড়ে। তবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অন্তত ৮০ শতাংশ মাড়োয়ারি মদ স্পর্শ করেন না এবং ধূমপান করেন না। - 'আমরা মদ খাই ন া, ধূমপান করি না এবং নিরামিষ আহার করি ', বললেন বি.কে বিড়লা। ইন্ডিয়ানচেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি দীপক খৈতান অবশ্য জানালেন যে , তিনি আমিষ খাবার পছন্দ করেন। গ্র্যান্ড হোটেলের দোতলায় বেলভেডিয়ের ক্লাবে বসে কথা হয়েছিল খৈতানের সঙ্গে। সবে লাঞ্চ সেরেছেন তিনি । জিজ্ঞেস করলাম, 'মদ্যপান করেন না? ' - 'ওহ নো, থ্য াংক গড', প্রশ্ন শুনে প্রায় যেন আঁতকে উঠেছিলেন খৈতান।

ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব এত বেশি বলেই মাড়োয়ারিরা সামগ্রিকভাবে তাঁদের জীবনকে বাঁধা নিয়মের মধ্যে বেশ কিছুটা ধরে রাখতে পেরেছেন। জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে গবেষণা চালিয়ে মাড়োয়ারিদের স ম্পর্কে একটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ বই লিখেছেন ডঃ ভি কে ট্যাকনেক । নামঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অনট্রেপ্রেনারশিপ অর শেখাওয়াটি মাড়োয়ারিজ'। তিনি বলেছেন, ধর্মই মাড়োয়ারিদের জীবনের মূল ভিত্তি। তাদের গদির চারধারে ঝোলানো থাকে দেবদেবীর ছবি। প্রত্যেক দেবদেবীকে আলাদা আলাদাভাবে প্রনাম না করে তাঁরা দিনের কাজ শু করেন না। দিনের হিসাব শু করার আগে হিসাবের খাতায় তাঁরা লেখেনঃ 'গণেশায় নমঃ , শুভ লাভ'। দীপাবলীর দিন তাঁরা লক্ষীর আরাধনা করেন । দেবীপ্রতিমার সামনে রাখা হয় কলম, কালিদান এবং বই । বইয়েরওপর কুমকুম দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয় । লক্ষী হলেন ধনদেবী। দীপাবলীতে প্রতীকী অর্থে কালী এবং সরস্বতীরও আরাধনা করা হয় । বই ওকলম সরস্বতীর এবং কা লির দোয়াত মা কালীর প্রতীক।

বাঙালীদের যদি হয় বারো মাসে তেরো পার্বন, মাড়োয়ারিদের তাহলে বারো মাসে একশো তিরিশ পার্বন।প্রায় প্রত্যেক দিনই মাড়োয়ারিদের বাড়িতে কোন না কোন পুজো লেগে আছে। হোলি আর দেওয়ালি মাড়োয়ারিদের সবথেকে বড় পার্বণ। চৈত্র মাসে হোলি আর আশ্বিন-কার্তিকে দেওয়ালি। বৈশাখে ব্রাহ্মণদের সম্মান দেখানোর জন্য তাঁদের ফল, কুঁজো, ইত্যাদি দান করা হয়। নাগপঞ্চমীতে সর্পদেবতার পুজো। ভাদ্রে আমলকী গাছের পুজো। পুকুরকেও পুজো করা হয়। দেওয়ালির পরের দিন গোবর্ধন বা গোবরের পুজো। মকর সংক্রান্তির দিন সূর্যপূজা। সব পার্বনেই নতুন নতুন খাবার তৈরী হয়। দেওয়ালিতে পুরি হালুয়া। পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ ব্রতের সময় সিন্নি। একাদশীর দিন বাদামের হালুয়া।

মাড়োয়ারিদের মধ্যে জৈনরা আবার সবথেকে বেশি আচারনিষ্ঠ। সূর্যাস্তের পর তাঁদের জলস্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। বিনয় মুকিম এবং বিজয় সিং নাহার, দুজনেই জানিয়েছিলেন যে তাঁরা এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। সন্ধের আগেই তাঁদের নৈশাহার শেষ হয়ে যায়। পরিবারের অন্যান্যদের , বিশেষত তণ সদস্যদের পক্ষে অবশ্য এত কঠোর নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না।

সামাজিক জীবনে মাড়োয়ারিরা প্রবলভাবে রক্ষনশীল । মাড়োয়ারি মেয়েরা আজকাল ক্লাবে যায়, পার্টিতেযায়। কিন্তু এটা বহিরঙ্গ। অন্তর্জীবনে মাড়োয়ারি সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া এবং সংরক্ষনবাদী। শহরে বালিকা বিবাহেরচল উঠে গেছে, কিন্তু প্রেমজ বিবাহের চল অত্যন্ত কম। বিয়ের শর্ত সাধারণত ঠিক করেন পাত্র-পাত্রীর বাবা-মা এবংঅন্যান্য গুজনরা।

মাড়োয়ারিদের মধ্যে পণপ্রথা এখনও ব্যাপক ।- 'মেয়ে জন্মালেই বাবা -মা তার বিয়ের জন্য টাকা জমাতেশু করে। কারণ তারা জানে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যথেষ্ট নগদ টাকা খরচ করতে হবে', বললেন সুশীলা কেজারিওয়াল। মাড়োয়ারিদের সংগঠন ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের সদস্যা ছিলেন তিনি। বললেন,' আমাদের সমাজে পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয় ছেলেরা। মেয়েরা বিয়ের সময় যেসব গহনা আর টাকা পায়, সেটা স্ত্রীধন, অর্থাৎ তাদের সম্পত্তি।'

রতন শাহ অবশ্য পণপ্রথার ঘোর বিরোধী। তাঁর উদ্যোগে মাড়োয়ারি সম্মেলন বিনাপনে বেশকিছু মেয়েকেবিয়ে দিয়েছে। শাহ বললেন,'পণের দাবি মেটাতে গিয়ে কত গরিব মাড়োয়ারি পরিবার শেষ হয়ে গেছে, তার খবর কজন রাখেন এক্ষুনি এই প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। নাহলে মাড়োয়ারি সমাজে অগ্রগতি আসবে না।'

ব্যবসা- বাণিজ্য

বাঙালিদের মধ্যে এখনও মাড়োয়ারিদের সম্পর্কে একটা নাক উঁচু ভাব আছে। তাদের চোখে মাড়োয়ারিরাহল অমার্জিত , অসংস্কৃত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। দুর্ভাগ্যের কথা হল, এভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে করতে বাঙালিরা যে কখন মাড়োয়ারিদের বহু পিছনে পড়ে গেছে, তা তাদের নিজেদেরই খেয়াল নেই। ব্যবসা তো বহুদিন আগেই বাঙালিদের হাত থেকে চলে গেছে। বিভিন্ন বৃত্তিতে মাড়োয়ারিরা এখন ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছেন। উচচশিক্ষিতের সংখ্যাও তাদের মধ্যে কম নয়। মাড়োয়ারিদের 'মেড়ো' বলে তাচ্ছিল্য করার আগে আজকাল বাঙালিদের একটু ইতস্তত করতে হয়।

বাঙালি মানসিকতা সম্পর্কে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন শ্যামানন্দ জালান। বললেন,'একটা সময় ছিল যখন অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা সব বিষয়ে বাঙালির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। এতে বাঙালির মধ্যে একটা অহঙ্কারেরভাব এসেছিল যার ফলে তারা স্নব হয়ে উঠেছিল। এখন অবস্থাটা অন্যরকম । ব্যবসায় বাঙালি বহু আগেই পিছু হটেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে এখন পেছনে সরতে শু করেছে। সেই সঙ্গে তার স্নবারিও কমেছে, কারণ সে এখন আসল অবস্থাটা বুঝতে পারছে।'

বাঙালির 'স্নবারি' সম্পর্কে শ্যামানন্দের মতামত একটু অপ্রিয় শোনাতে পারে। কিন্তু তা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শ্যামানন্দের বাবা প্রয়াত ঈশ্বরীপ্রসাদ জালান ছিলেন স্বাধীনতোত্তর যুগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম স্পিকার। তিনি স্পিকার হবার পর একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ঃ 'এ রাজ্যে কিকোন যোগ্য বাঙালি ছিল না যে শেষ পর্যন্ত একজন মাড়োয়ারিকে স্পিকার পদে বসাতে হল?' আত্মগরিমা বাঙালিকে সেদিন এতটাই সংকীর্ণ এবং প্রাদেশিকতাবাদী করে তুলেছিল।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ পাটকল, সুতোকল একসময় বাঙালির হাতে ছিল। সেগুলো তো মাড়োয়ারিরা কেড়ে নেয় নি। তাহলে ব্যবসার মালিকানা তাদের হাতে গেল কী করে?

এর সহজ উত্তর ঃ বাঙালি যখন পায়রা উড়িয়ে বাঈজি নাচিয়ে বাবুয়ানাতে মত্ত, মাড়োয়ারিরা তখন নিত্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টায় নিমগ্ন। এই প্রতিযোগিতায় বাঙালিরা সহজেই মাড়োয়ারিদের কাছে পরাস্ত

হয়েছে।

কলকাতায় মাড়োয়ারিরা প্রথমে ব্রিটিশ কোম্পানির দালাল বা 'ব্রোকার' হিসেবে কাজ শু করে। এর আগে এই কাজে একমাত্র বাঙালিরাই পারদর্শী ছিল। এবার মাড়োয়ারিরা এসে সেই স্থান অধিকার করল। ১৯১৬-১৮সালে শিল্প কমিশনের রিপোর্টে মাড়োয়ারিদের পরিশ্রম ও উদ্যোগের প্রশংসা করে বলা হয়েছিল যে, শুধু কলকাতাতেই নয়, বাংল ার অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যবসার চাবিকাঠি ক্রমশ বাঙালিদের হাত থেকে মাড়োয়ারিদের হাতে চলে যাচ্ছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে - বিশেষত ১৯১০ সালের পর- মাড়োয়ারিরা শিল্প স্থাপনের দিকে মনোযোগী হন। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে পর পর তিনটি পাটকল তৈরি করে সূরযমল নাগরমল কোম্পানি। কলকাতায় বিড়লাদের প্রথম পাটকল চালু হয় ১৯১৯ সালে। কলকাতার কাছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্যর স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদও একটি পাটকল তৈরি করেন। বিড়লারা কলকাতায় প্রথম তাঁদের বস্ত্রকল চালু করেন ১৯২০ সালে। পরের বছর গোয়ালিয়ারে তাঁরা বিখ্যাত 'গোয়ালিয়ার কটন মিল' স্থাপন করেন। গবেষক আর. এ শর্মা তাঁর 'অনট্রেপ্রেনুরিয়াল চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রি' গ্রন্থে জানিয়েছেন, স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত মাড়োয়ারিরা ৫২ টি বড় শিল্পে হাউসের মালিক ছিলেন। পার্শিদের হাতে ছিল ৬টি হাউস। বাঙালিদের হাতে একটিও নয়। দেশের সামগ্রিক শিল্পসম্পদের ৩০.৫ শতাংশই ছিল মাড়োয়ারিদের হ াতে। স্বাধীনতার পর মাড়োয়ারিদের ব্যবসা দ্রুত বাড়তে শু করে। ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলি কিনতে শু করেন তাঁরা। বেনেট অ্যান্ডি কোলম্যান থেকে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকা কিনে নেন ডালমিয়া। বাঙুররা কেনেন কেটেলওয়েল বুলেন কোম্পানি। ডানকান ব্রাদার্সের মালিক হন বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা। এভাবে ১৯৫২ সালের মধ্যে ৬৬ টি বিদেশি সংস্থা ভারতীয়দের হাতে চলে আসে।

এম এম মেহেতা তাঁর 'ষ্ট্রাকচার অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রিজ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ১৯১১ সালের আগে এদেশের শিল্পে মাড়োয় ারিদের কোন চিহ্ ছিল না। অর্থাৎ তাদের হাতে কোন কোম্পানি ছিলনা। অন্যদিকে, সে সময় পার্শিরা ১৫টি শিল্প সংস্থ ার মালিক ছিলেন। বাঙালিদের হাতে ছিল ৮টি কোম্পানি । ১৯৩১ সালে মাড়োয়ারিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৬ টি সংস্থা। ১৯৫১ সালে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংস্থা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৬। অন্যদিকে বাঙালি ও পার্শি মালিকানাধীন সংস্থার সংখ্যা বেড়ে হয় যথাক্রমে ১৯ এবং ২০।

মাড়োয়ারি চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। এজন্যই ব্যবসার জগতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও অটুট। কেতাবী শিক্ষার বদলে হাতে কলমে কাজ শেখার ওপরই আগে তাঁরা বেশি গুত্ব দিতেন। ত াঁদের ব্যবসাও চলত মুনিম - গোমস্তা নিয়ে জমিদারি ঢংয়ে। ঘনশ্যামদাস বিড়লা স্কুল ছাড়ার আগেই ব্যবসায় লেগে গিয়েছিলেন। নিজের ছেলে কৃষ্ণকুমার কে তিনি কাজ শেখাবার জন্য কেশোরাম রেয়ন কোম্পানির ক্যাশ বিভাগে সাধ ারণ কর্মী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। এখন যুগ বদলেছে। শিল্প পরিচালনার জন্য আধুনিক ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা মাড়োয়ারিরা উপলব্ধি করেছেন। আদিত্য বিড়লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম আই টি-তে পড়াশোনা করেছিলেন। দীপক খৈতান এম বি এ করেছেন জেনিভায়।

ব্যবসায় বড় হতে গেলে যে জিনিসটার সব থেকে বেশি প্রয়োজন তা হল ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা। আর ঝুঁকি নেবার সাহস অ াছে বলেই মাড়োয়ারিরা আজ সফল। পবন ইয়া বললেন,'আমরা অসম্ভব পরিশ্রম করি, সেটা ঠিক। আমাদের ব্যবসা য়িক বুদ্ধি আছে, সেটাও ঠিক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঝুঁকি নিতে না জানলে আমরা এগোতে পারতাম না।'

পবন ইয়ার সঙ্গে দীপক খৈতানও সহমত। বললেন,'কে কতটা ঝুঁকি নিতে পারছে তার ওপর কে কতটা সফল হবে তা নির্ভর করে। মাড়োয়ারিরা ঝুঁকি নিতে পরোয়া করে না।'

শেষকথা

ব্যবসাতে সার্বিক সাফল্য সত্ত্বেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মাড়োয়ারিরা যে তুলনীয় কৃতিত্ব দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেকথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।- 'আজকের মাড়োয়ারি তণ-তণীরা এত বেশি অর্থমনস্ক যে দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের যে একটা কর্তব্য আছে সে কথা তারা মনে রাখে না', বললেন রতন শাহ।- 'নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহ াস সম্পর্কে তাঁরা কোন খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করে না।'

রতন শাহ যখন একথা বলছিলেন, তখন তাঁর গলায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ক্ষোভের ছাপ। এককালে মাড়োয়ারিরা দানধ্য

ানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই কলকাতাতেই তাঁরা দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন। রামগড়ের (রাজস্থান) পোদ্দাররা তাঁদের একটা বড় ফার্ম সেবামূলক কাজের জন্য দান করেছিলেন। বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ দান করেন ৮০ লাখ টাকা। বিড়লা পরিবারও দানধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ।

এখনকার মাড়োয়ারিরা মনে করেন, সমাজসেবার জন্য খরচ করা সরকারের দায়িত্ব। এ বিষয়ে গত প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় ফারাক ঘটে গেছে। একসময় ব্যবসায় নিষ্ঠার সঙ্গে সততা রক্ষা করে চলতেন মাড়োয়ারিরা। এখন মূল্যবোধ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই । ডঃ ট্যাকনেট তাঁর বইয়ে কোনরকম রাখঢাক না রেখে লিখেছেন, আজকের মাড়োয়ারিরা মুনাফা অর্জনের জন্য সবরকম পথ নিতে প্রস্তুত - তা ভালো বা মন্দ, যাই-ই হোক না কেন।

একসময় সাহিত্যচর্চায় কলকাতার মাড়োয়ারিদের অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বভারতীর গভর্নিং বডিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে সীতারাম সেকসারিয়াকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। মাড়োয়ারি শিক্ষাব্রতীরাই উদ্যোগ নিয়ে টাকা যোগাড় করে শান্তিনিকেতনে হিন্দি ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন ভঁবরমল সিংহী। মাড়োয়ারিদের মধ্যে এখন লেখক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কলকাতায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন তাঁরা বাংলায় লেখেন। যেমন দেবকী আগরওয়াল। লেখক হিসেবে তাঁর ছদ্মনাম দেবর্ষি সারোগী।

সামগ্রিকভাবে মাড়োয়ারিরা পরিচয়হীনতার সংকটে ভুগছেন বলে রতন শাহ মনে করেন।- 'ব্যবসায়ী জাতহিসেবে যে অপবাদ মাড়োয়ারিদের জুটেছে তা মুছতে হলে তণ-তণীদের ঐতিহ্য সচেতন হয়ে উঠতে হবে', বললেন তিনি। - 'সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে হবে। নাহলে তারা অর্থোপার্জনকরতে পারবে ঠিকই, কিন্তু বানিয়া অপবাদ তাদের ঘুচবে না।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com